Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.56-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নীতিশিক্ষা: হিতোপদেশের লোকায়ত দর্পণে

ড. মৃন্ময় চক্রবর্ত্তী
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

19th-century Indologists attributed the text to Vishnu Sharma, a narrator and character that often appears in its fables. Upon the discovery of the oldest known manuscript of the text in Nepal, dated to 1373, and the preparation of a critical edition, scholars generally accept the authority of its two concluding verses. These verses mention Narayana as the author and a king called Dhavala Chandra as the patron of the text. But as no other work by this author is known, and since the ruler mentioned has not been traced in other sources, we know almost nothing of either of them. Dating the work is therefore problematic. There are quotations within it from 8th century works and other internal evidence may point to an East Indian origin during the later Pala Empire (8th-12th century).

Narayana says that the purpose of creating the work is to encourage proficiency in Sanskrit expression (samskrita-uktishu) and knowledge of wise behaviour (niti-vidyam). This is done through the telling of moral stories in which birds, beasts and humans interact. Interest is maintained through the device of enclosed narratives in which a story is interrupted by an illustrative tale before resuming. The style is elaborate and there are frequent pithy verse interludes to illustrate the points made by the various speakers. On account of these, which provide by far the greater part of the text, the work has been described as an anthology of (sometimes contradictory) verses from widespread sources relating to statecraft.

The Hitopadesha is quite similar to the ancient Sanskrit classic, the Panchatantra, another collection of fables with morals. Both have an identical frame story, although the Hitopadesha differs by having only four divisions to the ancient text's five. According to Ludwik Sternbach's critical edition of the text, the Panchatantra is the primary source of some 75% of the Hitopadesha's content, while a third of its verses can be traced to the Panchatantra. In his own introductory verses, Narayana acknowledges that he is indebted to the Panchatantra and 'another work'. The latter is unknown but may possibly be the Dharmasastras or some other.

The Hitopadesha is organized into four books, with a preface section called Prastavika. The opening verse expresses reverence to the Hindu god Ganesha and goddess

Saraswati.[7] There are several versions of the text available, though the versions are quite similar unlike other ancient and medieval era Hindu texts wherein the versions vary significantly. The shortest version has 655 verses, while the longest has 749 verses. In the version translated by Wilkins, the first book of Hitopadesha has nine fables, the second and third each have ten, while the fourth has thirteen fables.

মানুষের গল্প শোনার আকর্ষন চিরন্তন। নিজেদের কল্পনাকে প্রশ্রয় দেবার সবথেকে সহজ মাধ্যম হিসাবে শৈশবকাল থেকেই আমাদের গল্পের সাথে পরিচিত। শিশুদের শান্ত রাখার জন্য বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য গল্প শোনানোর রেওয়াজ চলে আসছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। কিন্তু সেই প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যেই কোনো না কোনো শিক্ষা লুকিয়ে থাকে। সেই শিক্ষাগুলো গ্রহন করতে পারলে জীবনে এগিয়ে চলার পথ সুগম হয়, জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। নিছক তত্ত্বকথা বালকবালিকাদের মনোগ্রাহী হবে না বা তারা ঠিকঠাক বুঝতে পারবে না বলেই গল্পের আকারে সাজিয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিতরণের প্রচলন হয়েছিল, যা শাশ্বত পন্থা। এইভাবেই গল্পসাহিত্যের উদ্ভব এবং বিভিন্ন গল্পকারের দ্বারা এই সাহিত্যভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অন্যতম গল্পগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ্য পন্ডিত নারায়ণ শর্মা বিরচিত 'হিতোপদেশ' গল্পগ্রন্থটি। কথিত আছে ভগিরথীতীরে পাটলিপুত্র নগরে সুদর্শন রাজার পুত্রদের শিক্ষাদানের জন্য এই সার্থকনামা গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন। এইজন্য তিনি অবশ্য পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' গল্পগ্রন্থটি ও অন্যান্য কিছু রচনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন "পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে"।[১] গ্রন্থটি মিনলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারটি খন্ডে বিভক্ত। গল্পসংখ্যা বিয়াল্লিশ। একগল্প থেকে অন্য গল্পের অবতারণা হয়েছে অনায়াসেই, আর সেই প্রসঙ্গে মনিমুক্তার মতো অসংখ্য শ্লোক লিপিবদ্ধ হয়েছে। হিত উপদেশ দানের জন্য ঐ শ্লোকগুলিই যথেষ্ট ছিল, গল্পগুলো আমাদের বাড়তি পাওনা। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে যে 'সুভাষিতানি' থাকে সেগুলোর বেশ কিছু এখান থেকে উদ্ধৃত। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে আবার এর কিছু অংশ অনুবাদ করতে হয়। অনেক গল্প মুখে মুখে ফেরে ছোটোদের বিভিন্ন গল্পের বইয়ে মনোহর গল্পের সমাবেশ দেখা যায়, যেগুলো আসলে কিনা হিতোপদেশের অন্তর্গত। যেমন সোনার কাকন দাতা বাঘ, অন্ধশকুনি, হরিণ-শেয়ালের বন্ধুত্ব, কাকদম্পতীর সাধের সংসার, কাকড়া-বকের গল্প, ব্রাহ্মণ -নকুলকথা, তিনধূর্ত ও ব্রাহ্মণের কথা, মনিমূষিক কথা, নীলবর্ণ শৃগাল, ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভের গল্প, অতিরিক্ত সঞ্চয়ী শেয়ালের গল্প, চিত্রগ্রীব পায়রার গল্প, বীরবর কথা আরো কত কি!

গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি মানবচরিত্র বাদ দিলে বেশিরভাগই পশুপাখির চরিত্রে সংলাপ বসানো হয়েছে। তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে মানবজীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি, লোভ, ভন্ডামি, স্খলন, সুবিধাবাদ থেকে আরম্ভ করে সংহতি, উদারতা, ত্যাগ, সরলতা, অদম্য পৌরুষের বিজয় ইত্যাদি অনেক কিছু। ঠিক একারণেই কৌতুহল বাড়তে থাকে যে, আমাদের ব্যক্তিজীবনে তথা সমাজ জীবনে কাজে লাগে এমন কি কি উপদেশ পাওয়া যাবে এই অমূল্য গ্রন্থটি থেকে! কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে সমস্ত উপদেশগুলি আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তবে একটি বিশেষ বিষয়, যা আমাদের জীবনে খুবই প্রভাব ফেলে তা হল- মানুষ চেনা। মানবদূষনে ভরপুর এই সমাজে প্রকৃত সৎ, নম্র, ভদ্র মানুষ চিনবেন কী করে? সে সম্পর্কে অবগত না থাকলে ঠকে যেতে হয়, ভুল হয়ে যায় বারবার। জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির ধাক্কাও সামলাতে হয়, সুতরাং মানুষ চেনা খুবই Important। তাই 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের আলোকে এ বিষয়ে মূল্যবান উপদেশগুলি স্মরণ করব।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, পুথিগতবিদ্যা বা ভালো চাকুরি এসব দিয়ে মানুষটা ভালো কি না তা বিচার করা যায় না। এসবকিছুর উপরে থাকে স্বভাব। তাই মানুষ চিনতে গেলে তার স্বভাব চরিত্র কেমন তা আগে দেখতে হয় -

"সর্ব্বস্য হি পরীক্ষান্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্ধিন বর্ত্ততে।।"[২]

গন্ধহীন পলাশ ফুলের ন্যায় বিদ্যাহীন ব্যক্তিও শোভা পায় না, তা সে যতই খ্যাতনামা বংশের হোক বা বিশাল রূপযৌবন থাকুক না কেন!

"রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ"।
বিদ্যাহীনা ন শোভতে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ"।।[৩]

আবার শুধু বিদ্যা থাকলেই সকলেই হয় না, বিদ্বান ব্যক্তি যদি বিনয়ী হন তবেই তাঁর বিদ্যার্জন সম্পূর্ণ হয় –

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"[৪]

কামনা বাসনাকে পিছনে ফেলে বৈরাগ্যের পথ ধরে সম্মুখে এগিয়ে যেতে পারেন যিনি, তাঁর বিদ্যাই সার্থক

"তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠত কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্''।।[৫]

নিষ্কাম হৃদয়ে সদা স্বার্থ বিসর্জন- এটি মহাত্মার অন্যতম গুণ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যাসাধন, সত্য, ধৃতি, ক্ষমা আর লোভবিসর্জন এই আট প্রকার ধর্মের লক্ষণ ধর্মশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এগুলির মধ্যে প্রথম চারটি অর্থাৎ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যাসাধন দাম্ভিক ব্যক্তিও করতে পারেন। কিন্তু সত্য, ধৃতি, ক্ষমা ও লোভবিসর্জন- এই চারটি শুধুমাত্র সাধু বা সৎ ব্যক্তির মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

"অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিষ্ণু স্মৃতঃ"।।[৬]

পরের স্ত্রীকে মাতার সমান, অন্যের সম্পদ মাটির ঢেলার মতো, সকলজীবকে নিজের মতো যিনি দেখেন তিনিই যথার্থ সাধু ব্যক্তি।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
অত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিত"।।[৭]

বিপদে অটল ধৈয্য, ক্ষমা অভ্যুদয়ে, সভায় বাগ্মিতা, বীর্য্য যুদ্ধের সময়ে, যশে অভিলাষ, নেশা শাস্ত্রেই কেবল মহাত্মার মধ্যে থাকে।

"বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা সদসি বাকপটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্"।।[৮]

ক্ষুদ্রমতি নর আপন-পর ভাবে কিন্তু মহান ব্যক্তির নিকট বিশ্বই আপন পরিবার-

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গননা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।"[৯]

আর কিছু না থাকলেও অতিথি আপ্যায়নের জন্য জল আর সুমিষ্ট বচনের অভাব থাকে না সাধু ব্যক্তির গৃহে।

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন"।[১০]

বাড়িতে এলে তিনি বালক-বৃদ্ধ অভ্যাগত সকলকে সম্মান করেন। চাঁদ যেমন চন্ডালের ঘরেও আলো দেয়, তেমনি ভদ্রব্যক্তি নির্গুণ ব্যক্তির প্রতিও দয়া করেন ।

"নির্গুণেষবপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্ডশ্চান্ডালবেশ্মনি"।।[১১]

জলন্ত নুড়ায় যেমন সিন্ধুজল গরম করতে পারে না, তেমনি কেউ রাগালেও সাধু ব্যক্তির চিত্ত বিকৃত হয় না।

"সাধোঃ প্রকোপিস্যাপি মনো নায়াতি বিক্রিয়াম।
ন হি তাপয়িতুং শক্যৎ সাগরান্তস্তৃণোল্কয়া।"[১২]

নারিকেল ফলের মতো গুণীব্যক্তির বাইরে চাকচিকা থাকে না, ভেতরেই সার। অর্থ্যাৎ লোকদেখানো সাজসজ্জার অড়ম্বরবর্জিত থাকেন প্রকৃত নম্র ব্যক্তি।

"নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তেহপি হি সজ্জনাঃ।
অন্যে বদরিকাকা বাহিরের মনোহরাঃ"।।[১৩]

মন আর মুখ এক না হলে ধর্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার থাকে না। ধার্মিক মহাত্মা মনে যা ভাবেন, মুখে তাই বলেন, কাজে তাই প্রকাশ পায়, গরমিল হয় না।

"মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যত্ কর্ম্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মেণ্যেকং মহাত্মনাম্ ।।"[১৪]

শত শত স্বার্থত্যাগ করেও তিনি বিবাদ পরিহার করেন। পরহিতে ধনপ্রাণ দান করা মহান ব্যক্তিদের অন্যতম একটি লক্ষন।

"শতং দদ্যান্ন বিবদেদিতি বিজ্ঞস্য সম্মতম্।
বিনা হেতুমপি দ্বন্দমিতি মূর্খস্য লক্ষণম্ ।।"[১৫]

কোনোভাবে বিপদ উপস্থিত হলে ধৈয্য ও বীর্যের দ্বারা তিনি সহজেই সেই বিপদের প্রতিকার করতে পারেন।

"বিপত্তৌ হি মহান্ লোকে ধীরত্বমধিগচ্ছতি।।"[১৬]

মন, ইন্দ্রিয় সকল তিনি অবশ্যই সংযত রাখেন, কারণ এভাবে ইন্দ্রিয় জয় না হলে বনে গেলেও তার অনাচার ঘটে, আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয় গৃহে থেকেও তার তপস্যা সিদ্ধ হয়। বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন, গৃহই তার পক্ষে তপোবন হয়।

"বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্ গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মাণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।।"[১৭]

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য এই ছয়টি দোষ তিনি অবশ্যই পরিহার করে চলেন-

"কামঃ ক্রোধে মদো মোহো লোভো মাৎসর্য্যমেব চ।
ষড়বর্গমুৎসৃজেদনমহিংস্তাক্তে সুখী ভবেৎ।"[১৮]

শুচি, দাতা, সত্যশীল, সরল উদার, অনুরক্ত, ক্ষমতাসম্পন্ন, সুখে দুঃখে নির্বিকার হয়ে থাকেন এইসব ব্যক্তি।

"শুচিত্বং ত্যাগিতা শৌর্যং সামান্যং সুখদুঃখয়োঃ।

দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্গুণাঃ।।"[১৯]

সন্তুষ্ট থাকার জন্য তাঁর হৃদয় সুখে পূর্ণ থাকে। যার মনে সন্তুষ্টি সকল সম্পদই তার করায়ত্ত, যার চরণযুগল চর্মের পাদুকায় আবৃত তার তো সকল স্থানই চমর্ময় ।

"সর্ব্বাঃ সম্পওয়ন্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদগূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ।।"[২০]

তিনি হঠাৎ কোনো কাজ করেন না, সুবিচারে সকল কাজ সম্পন্ন করেন-

''সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুকাঃ স্বয়মের সম্পদঃ।।"[২১]

গুরু, আত্মীয়, বন্ধু, ভৃত্য, দীন দুঃখী জন এসবারে যিনি পালন করেন তিনিই প্রকৃত মানুষ।

"যো নাত্মনে ন চ গুরৌ ন চ ভৃত্যবর্গে দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ বন্ধুবর্গে।
কিং তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যলোকে কাকোঽপি জীবতি চিরং চ বলিং চ ভুঙক্তে।"[২২]

পরিশ্রম করতে তিনি পিছপা হবেন না, কারণ কর্মে দোষ এলে ক্রমে অধোগতি হয় আর কর্মগুণেই উন্নতি সম্ভব। উন্নতির জন্য নিরলস যত্ন করতে হয়। অবনতি হয়ে যায় সহজেই। তাই জীবন সার্থক করে তোলার জন্য নিরন্তর প্রয়াস করেন মহাত্মাগণ।

"আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাধস্তথাত্মা গুণদোষয়েঃ ॥"

কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, মহান ব্যক্তিদের অজস্র গুণের দু একটা গুণ কোনো কোনো দুরাত্মার মধ্যেও থাকতে পারে। শয়তানরাও সুহৃদয় ব্যক্তিরূপে হাসিমুখে ঘুরে বেড়ায়, সুমিষ্ট কথার কৌশলে মানুষের মন জিতে নিয়ে তাকে গ্রাস করতে চায়, সে কথায় ভুললেই বিপদ। কারণ জিহ্বাগ্রে মধুভরা থাকলেও তাদের হৃদয় বিষেভরা থাকে।

"দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদবিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্টতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হলাহলং বিষম্।।"[২২]

উদার সুজন বন্ধুর ছদ্মবেশ ধারণ করে অনেক ঘৃণ্য ব্যক্তিও নিজেকে আড়াল করে রাখে। বিদ্যায় ভূষিত হলেও দুর্জন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের বিদ্যাই তো ছদ্মবেশ ধারনের প্রধান উপকরণ। বিষধর সাপের মাথায় মহামূল্যবান মণি শোভা পেলেও তা যেমন ভয়ঙ্কর দুর্জন ব্যক্তিও সেইরকম।

"দুর্জ্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ"।।[২৩]

এমন ব্যক্তিরও অভাব নেই যে, প্রথমে পায়ে এসে পড়ে, তারপর চুপিসারে ক্ষতিসাধন করে। মশা যেমন গুন গুন করে গান শোনায় আর ছিদ্র পেলেই নির্ভয়ে প্রবেশ করে, সেরকমই।

"প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসম্। কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রম্।
ছিদ্র নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ সর্ব্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি।"[২৪]

দুর্জন মাটির ঘটের মতো, সহজেই ভেঙ্গে যায় আর মিলন হয় না; সুজন ঠিক তার উল্টো সোনার ঘটের মতো কষ্টে ভাঙ্গে কিন্তু সহজেই মিলন হয় । -

"মৃদঘটবৎ সুখভেদ্যো দুঃসন্ধানশ্চ দুর্জ্জনো ভবতি।
সুজনস্তু কনকঘটবদদুর্ভেদ্যশ্চাশু সন্ধেয়ঃ।।"[২৭]

দুর্জনের সাথে শত্রুতা-মিত্রতা কোনোটাই উচিত নয়। কারণ দুর্জন অঙ্গারতুলা গরম থাকলে পুড়িয়ে দেয় আর ঠান্ডা হলে কালি মাখিয়ে দেয়।

"দুর্জনেন সমং বৈর -প্রীতিঙ্কাপি ন কারয়েৎ।
উষ্ণে দহতি চাঙ্গার শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্।।"[২৮]

দুর্জনে যদি হেসেও প্রিয়কথা বলে, তাহলেও তা অকাল-কুসুম সম শুভ নয় ট

''দুজ্জানৈরুচ্যমানানি সম্মিতানি প্রিয়াণ্যপি।
অকালকুসুমানীর ভয়ং সংজনয়ন্তি হি।।"[২৯]

অধমের যথেষ্ট উপকার করলেও বালুকায় রেখাসম তার কোনো ফল নেই ট্র

''নীচেষূপকৃতং রাজন বালুকাম্বিব মুদ্রিতম্।"[৩০]

যতই যত্নে পালন করা হোক না কেন, দুর্জন তার স্বভাব ছাড়ে না কখনো। ঠিক যেমন তেল জল দিয়ে মর্দন করলেও কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয় না।

"দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোঽপি নিত্যশঃ।
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতম্।।"[৩১]

অমৃত বর্ষণ করলেও তাতে সুফল ফলে না তেমনি খল ব্যক্তিও পালন-সম্মান কিছুতেই তুষ্ট হয় না।

"বর্দ্ধনং বাহথ সম্মানঃ খলানাং প্রীতয়ে কুতঃ।
ফলন্তামৃতসেকেঽপি ন পধ্যানি বিষদুমাঃ।।"[৩২]

নশ্বর এই জীবনে এমনিতেই তো কত সমস্যা, শোক, অসুখে মানুষ জর্জরিত। প্রতিদিন কত নিত্যনূতন বিপদ-আপদ অতিক্রম করে জীবনতরী এগিয়ে চলে তার উপরে আবার মানুষে মানুষে এত হিংসা, হানাহানি কেন? শাস্ত্রে বলা হয়েছে- 'সেই ধর্ম, সর্বভূতে যদি দয়া রয়; সেই সুখ যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয়। সেই স্নেহ সর্বজীবে সমান প্রণয়, সেই তো পান্ডিত্য হিতোহিতের নির্ণয়।

''কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ।
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পান্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ।।"[৩৩]

"Time and tide wait for none" -দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যেই সময় যে যত পেরিয়ে যায় তার হিসাব রাখা মুশকিল। প্রবৃত্তির বশে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, আমাদের নিদিষ্ট কোনো আয়ু নেই। যে কোনো দিন মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে পরলোকে। যার যেদিন পালা আসবে তার সেদিন এই ভবের খেলা সাঙ্গ হবে। তাই অনির্দিষ্টকালের জন্য পাওয়া এই জীবনকে সমৃদ্ধ করে নিতে হয় বিদ্যা, জ্ঞান, উদ্যোগ, ধর্মাদি উপাদানগুলির মধ্যেমে। এটা পারলে জীবন সার্থক আর প্রবৃত্তির টানে ভেসে গেলে কোন নরকে গিয়ে পৌছাব তার কোনো ইয়ত্তা নেই। জলমধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করলে তরঙ্গবিক্ষোভে তা যেমন চঞ্চল দেখায়, তেমনই এই জগতে জীবন অস্থির, তাই নিরন্তর সনাতন ধর্মে মন রেখে চলা উচিত।

''জলান্তশ্চন্দ্রচপলং জীবিতং খলু দেহিনাম্।
তথাবিধমিতি জ্ঞাড়া শশুৎ কল্যাণমাচরেৎ।।"[৩৪]

কিন্তু সমস্যা হল যে, প্রকৃত সার্থকতার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাধনা লাগে, সবাই তা পারে না। যারা পারে না বা পারার প্রয়োজনও বোধ করে না, তারা তাদের মতো করে সস্তার Lifestyle গড়ে তোলে আর পারিপার্শ্বিক তথা পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে নেতিবাচকতায় প্রভাবিত করে তোলে। তাতে ক্রমান্বয়ে সমাজ দূষিত হতে থাকে। দুশ্চিন্তার বিষয় এটাই যে, দূষণ ছড়ানো মানুষের সংখ্যাই এখন বেশি। এদের কি সত্যিই মানব সম্পদ বলা চলে?

পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে এখন বিদ্বান প্রায় সকলেই কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ পুষ্ট হচ্ছে কী? না, বরং উল্টো! বিদ্যার ভার যত বাড়ছে পাল্লা দিয়ে কমে যাচ্ছে মূল্যবোধ! সেইজন্যই তো সমাজে এত কদার্যতা বেড়ে যাচ্ছে! অন্যের ভালো চাওয়া তো দূরের কথা, ভালো কিছু দেখে সহ্য করার মতো মানুষও খুঁজে পাওয়া ভার। মুখোশধারী নরপশু মানুষের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই অপরদিকের মানুষটিকে একেবারে শেষ করে ফেলে। স্বার্থ পরিচালিত ব্যক্তির নিকট লোলুপতাই ক্ষমতা হয়ে দাঁড়ায়, আর এই বিকৃত ক্ষমতার অহংকারেই মত্ত হয়ে ওঠে আধুনিক নর আধুনিকা নারী। চোখের সামনে দেখতে পাই, নিজের যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্তেও আরো বেশি অর্থের লালসায় এক স্বামী নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের বিছানায় এগিয়ে দেয় আর তার স্ত্রীও গর্বের সাথে তা Continue করে। এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে! আরো বেশি কষ্টের যে, চারিত্রিক শুদ্ধতা বঝায় রেখে চলা সাধারন ধার্মিক মানুষকে এরাই আবার উপহাস করে। অন্যের সম্পর্কে যা খুশি রটিয়ে দেয় এরা যৎপরনাস্তি আনন্দ উপভোগ করে। অন্যের সম্মান হানি করার জন্য অভিনয়ও করে দারুন! বলতে পারেন মানবদূষন কত শতাংশ? অধিকাংশ মা বাবার চোখে জল, অত্মমগ্ন সন্তানদের সময় নেই সসব চেয়ে দেখার! বৃদ্ধ বাবা মায়ের প্রতি সামান্য দায়িত্ব কর্তব্য বোধের ঘাটতি সর্বত্র, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছে ভেবে দেখছেন এখনকার Young মা বাবারা? সংবাদমাধ্যম গুলোতে প্রতিদিন আমানবিকতার অসংখ্য উদাহরণ আমাদের হতাশাগ্রস্ত করে তুলে।

যাই হোক, এখনো কিছু ভালো পরিবার, ভালো মানুষ আছেন নিশ্চয়ই। সহনশীন বহনশীল স্বচ্ছ মানসিকতার মানুষেরা যদি দৃষ্টান্তরূপে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াতে পারেন তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য রাখা হয়তো একটু সহজ হবে। একজন ভালো মানুষের সংস্পর্শে এসে হয়তো আরো দুজন ভদ্র সভ্য হয়ে উঠতে পারে। তাই এখন সৎসঙ্গ খুবই প্রয়োজন। সুতরাং দুর্জনের সঙ্গ ত্যাগ করে সৎসঙ্গে সময় কাটানো উচিত। সংসারে অনিত্যতা মনে রেখে দিনরাত্রি পুণ্যকর্ম আচরণ করা উচিত।

"ত্যাজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্।।"[৩৫]

ধনসম্পত্তি সব পায়ের ধূলার মতো, নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল যৌবন জলবিম্বের মতো ক্ষণিক মনুষ্যদশা, জীবন ফেনের মতো মিলিয়ে যায়। ধর্মই হল অক্ষয় স্বর্গসুখের উৎস, প্রাণপনে যে সেই ধর্মের আরাধনা না করে তার অনুতাপই সার, নিদারুণ দহে বারবার।

"অর্থঃ পানরজোপনা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনম্, মানুষ্যং জলেলোলবিন্দুচপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদঘাটনম্, পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে।।"[৩৬]

গন্তব্যস্থল মৃত্যু হলেও ভালো থাকাটাই আমাদের লক্ষ্য। সমষ্টিগতভাবে ভালো না থাকলে ব্যষ্টি অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখও ফিকে হয়ে যায়। শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহক শিক্ষা আমাদের সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে

দিতে পারে না, তাই আমার মনে হয়, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে এই ধরনের জীবিকানির্বাহক শিক্ষা একটা পর্যায়ে আরো গুরুত্ব সহকারে বিতরণ করা উচিত। এক্ষেত্রে হিতোপদেশগুলি খুবই Helpful। শুধু 'হিতোপদেশ' নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের যত্রতত্র এমন অনেক অমুল্য আকরিক ছড়িয়ে আছে। সেইসব কিছু গ্রহণ করে যদি বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা যায় তাহলে মানবদূষণ কিছুটা হলেও কমবে। সঠিক পদ্ধতির মধ্যে এগিয়ে গেলে আমরা নিশ্চয়ই মানবসম্পদে উন্নীত হতে পারবো! আসুন, চেষ্টা করা যাক, ধন্যবাদ।